بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৯ই জুলাই, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারা জারি রাখেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। কাযা বিভাগ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) নিয়মিত কাযা বা বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন; প্রতিটি অঞ্চলে তিনি নিয়মিত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাযী বা বিচারক নিযুক্ত করেন। তিনি বিচার-সংক্রান্ত আইনানুগ নির্দেশাবলীও জারি করেন। বিচারক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞদেরই প্রাধান্য দেওয়া হতো, তবে হযরত উমর (রা.) কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাই দেখতেন না, বরং তাদের পরীক্ষা বা যাচাইও করতেন। বিচারকদের জন্য তিনি বেশি বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতেন, যেন তারা কেউ ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান না করেন বা দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়। তিনি সম্পদশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিচারক নিযুক্ত করতেন, যেন সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় অন্য কারো দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়ার শঙ্কা না থাকে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিতেন তা স্বয়ং তাঁর নিজের একটি ঘটনা থেকে জানা যায়। একবার হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)'র সাথে হযরত উমর (রা.)'র কোন একটি বিষয়ে দ্বন্দ্ব হয়; হযরত উবাই (রা.) তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)'র আদালতে বিচারপ্রার্থী হন। হযরত যায়েদ (রা.) উভয়কেই আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত উমর (রা.) আদালতে উপস্থিত হলে স্বভাবতই তিনি তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ান, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাকে এরূপ সম্মান প্রদর্শনকে অন্যায্য আখ্যা দিয়ে হযরত উবাইয় (রা.)'র পাশে গিয়ে বসেন; তাঁর মতে আদালতের উচিত ছিল তাঁকে একজন সাধারণ বিবাদী হিসেবে গণ্য করা এবং বাদী-বিবাদী উভয়কে একই দৃষ্টিতে দেখা।

হযরত উমর (রা.) ইফতা বা ফতওয়া বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন এবং শরীয়ত-সংক্রান্ত বিষয়ে ফতওয়া বা সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য কয়েকজন সাহাবীর নাম ঘোষণা করে দেন; তারা হলেন, হযরত আলী (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) ও হযরত আবু দারদা (রা.)। তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ ফতওয়া দিলে হযরত উমর (রা.) তা নাকচ করে দিতেন। হযরত উমর (রা.) বিভিন্ন সময়ে এই মুফতীদের যাচাইও করতেন। ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.)'র এই অতি সাবধানতার পেছনে গভীর প্রজ্ঞা ছিল; যে কেউ চাইলেই যদি ফতওয়া দিতে পারতো তাহলে সমাজে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার উদ্ভব হতো এবং অনেক ফতওয়া জনসাধারণের জন্য পরীক্ষার কারণ হতো। কখনও কখনও পরিস্থিতি সাপেক্ষে একই রকম বিষয়ের জন্য দু'রকম ফতওয়া দেয়া হতে পারে এবং দু'টিই নিজ নিজ স্থানে সঠিক; কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে— একই বিষয়ে দু'রকম ফতওয়া কীভাবে সঠিক হতে পারে? আর এটা পরবর্তীতে তাদের জন্য পরীক্ষার কারণ হতে পারে।

হযরত উমর (রা.) দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন; দেশে আইনের যথাযথ প্রয়োগ, জনগণের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দায়িত্ব এই বিভাগের ওপর ন্যস্ত ছিল। তিনি নিয়মিত কারাগারও প্রতিষ্ঠা করেন; আইন ভঙ্গ করার অপরাধে কঠোর

শাস্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা ছিল। হযরত উমর (রা.) বায়তুল মাল-ও প্রতিষ্ঠা করেন; ইতিপূর্বে সেভাবে বায়তুল মালের অস্তিত্ব ছিল না, কোন সম্পদ এলে তা তৎক্ষণাৎ বণ্টন হয়ে যেত। হযরত উমর (রা.) সবার সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম (রা.)-কে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। মদীনার মতোই অন্যান্য প্রদেশেও বায়তুল মাল বা কোষাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে হুযূর (আই.) রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.)'র অত্যন্ত সচেতনতার কিছু উদাহরণও তুলে ধরেন। একবার প্রচণ্ড গরমের দিনে হযরত উসমান (রা.) দেখতে পান, এক ব্যক্তি দু'টি উটকে চরানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে। পরে দেখা যায়, তিনি হযরত উমর (রা.) যিনি সদকার দু'টি উট চরানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে দিয়ে বা অন্য কাউকে দিয়ে একাজ করানোর অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.) নিজেই একাজ করেন। হযরত উসমান (রা.) তখন বলেছিলেন, কেউ যদি কুরআনের ভাষ্য অনুসারে **'আল-কাভিয়্যুল-আমীন'** অর্থাৎ শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দেখতে চায়, তবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.)-কে দেখে নিক। আরেকবার অনুরূপ একটি ঘটনা দেখে হযরত আলী (রা.)ও তাঁর সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছিলেন, যেমনটি পবিত্র কুরআনের সূরা কাসাসে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। একবার হযরত আবু মূসা (রা.) বায়তুল মাল ঝাড়ু দিতে গিয়ে একটি দিরহাম পান; তিনি সেটি হযরত উমর (রা.)'র বাড়ির এক শিশুকে দিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) যখন শিশুটির হাতে তা দেখতে পান তখন এর বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন; পুরো বৃত্তান্ত জানার পর তিনি হযরত আবু মূসাকে এ কাজের জন্য কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এবং সেটি বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেন।

হযরত উমর (রা.) বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড করেছিলেন। কৃষিকাজের উন্নতি ও জনগণের পানির চাহিদা পূরণের জন্য তিনি বিভিন্ন খাল খনন করান। নয় মাইল দীর্ঘ আবু মূসা নামক খালটি দজলা নদী থেকে বসরা পর্যন্ত খনন করান; মা'কাল নামক খালটিও দজলা নদী থেকে খনন করা হয়েছিল। হযরত উমর (রা.)'র নির্দেশে লোহিত সাগরের সাথে নীলনদকে খাল কেটে সংযুক্ত করা হয়, সেই খালটির নাম ছিল **'আমীরুল মুমিনীনের খাল'**; ২৯ মাইল দীর্ঘ এই খালটি মাত্র ছ'মাসে খনন করা হয়। জনকল্যাণার্থে হযরত উমর (রা.) বিভিন্ন ইমারত বা স্থাপনাও নির্মাণ করান যন্মধ্যে মসজিদ, আদালত, সেনা-ছাউনি বা ব্যারাক, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজের দপ্তর, রাস্তা-ঘাট, পুল, অতিথিশালা, সরাইখানা, নিরাপত্তা ও তল্লাশি চৌকি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি নতুন নতুন শহর এবং বিভিন্ন প্রদেশেরও গোড়াপত্তন করেন; তিনি চেষ্টা করতেন— আরবের সীমানা যেখানেই অনারবদের সাথে যুক্ত সেখানে যেন কোন মুসলমান শহর থাকে, যেন শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

হযরত উমর (রা.) সেনাবাহিনীকেও সুবিন্যস্ত করেন এবং নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠিত হয়। যোগ্যতানুসারে তিনি সেনাদের রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন এবং তাদের নিয়মিত বেতনেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে দু'টি অংশে বিন্যস্ত করেন; নিয়মিত সৈনিক এবং অনিয়মিত সেনা বা স্বেচ্ছাসেবক, যাদেরকে জরুরি প্রয়োজনের সময় ডাকা হতো। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তার কঠোর নির্দেশ ছিল— বিজিত দেশে সৈনিকরা কৃষি বা বাণিজ্যের সাথে যেন সম্পৃক্ত হয়ে না পড়ে। সৈনিকদের জন্য সাঁতার, ধনুর্বিদ্যা ও খালি-পায়ে চলার এবং রেকাব-বিহীন অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণের বিষয়ে হযরত উমর (রা.)'র কঠোর নির্দেশ ছিল। চারমাস পর পর সৈনিকদের অবশ্যই নিজ পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয়ার নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.)'র যুগে

সেনাবাহিনীতে অনারব এমনকি অমুসলিম সেনারাও নিজ যোগ্যতানুসারে উচ্চপদে আসীন হতো; আল্লামা শিবলী ইতিহাস থেকে এরূপ অন্তত ছয়জন সেনা-কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন, বর্তমানে পাকিস্তানে আহমদী কর্মকর্তারা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র আহমদী হবার কারণে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চপদ প্রদান করা হয় না, যা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, পাকিস্তানের জন্য আহমদী অফিসারগণই সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছেন।

হযরত উমর (রা.) বাজার ব্যবস্থা এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা করেন; দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা কিংবা হ্রাস করাও ইসলামী শিক্ষানুসারে অবৈধ, কারণ এটিও অবৈধ সম্পদ অর্জনের একটি মাধ্যম। একবার মদীনার বাইরে থেকে আসা এক ব্যবসায়ী মদীনার বাজারে শুকনো আঙুর অন্যদের চেয়ে অনেক কম মূল্যে বিক্রি করছিল; হযরত উমর (রা.) তাকে নির্দেশ দেন, হয় অন্য কোথাও গিয়ে বিক্রি কর, নতুবা অন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যে তা বিক্রি কর। কেননা এরূপ হলে অন্য ব্যবসায়ীদের লোকসানের সম্মুখীন হতে হতো। সাহাবীদের কেউ কেউ হযরত উমর (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর একটি বাণী স্মরণ করান যে, বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়; কিন্তু হযরত উমর (রা.) বুঝিয়ে দেন যে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ, তা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পরিপন্থী নয়। বাজারে হস্তক্ষেপ বলতে মহানবী (সা.) চাহিদা ও যোগানে হস্তক্ষেপ বুঝিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটান। তিনি সারা দেশে অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের শিক্ষক নিযুক্ত করা হতো এবং তাদের জন্য বিশেষ ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়। হযরত উমর (রা.) হিজরী সন বা পঞ্জিকারও প্রবর্তন করেন এবং মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের নিরিখে এই পঞ্জিকার প্রচলন করেন, যা মূলত পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছিল; হুযূর (আই.) এ সংক্রান্ত নাতিদীর্ঘ ইতিহাসও তুলে ধরেন। হযরত উমর (রা.)'র যুগে সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রারও প্রচলন হয়; ১৭শ (সপ্তদশ) হিজরীতে তাঁর খিলাফতকালে দামেস্কে এই মুদ্রার প্রচলন হয় যার একপাশে **'আলহামদুলিল্লাহ্'** ও অন্যপাশে **'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্'** খোদিত থাকত। আল্লামা শিবলী নোমানী তার পুস্তক **'আল্ ফারুক'**-এ এমন চুয়াল্লিশটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যেগুলোর সূচনা হযরত উমর (রা.)'র যুগে হয়েছিল; তিনি এ-ও লিখেছেন যে, এগুলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয়ের সূচনা তাঁর যুগে হয়েছিল। তিনিই চার তরবীরে জানাযার নামায পড়া ও বাজামাত তারাবীহ্ নামাযের প্রচলন করেন। তিনি (রা.) যেসব কাজের সূচনা বা প্রবর্তন করেছেন হুযূর (আই.) তা একাধারে বর্ণনা করেন এবং এসব কাজের মোট সংখ্যা ছিল ৪৪টি। আল্লামা শিবলী নোমানীর মতে তিনি (রা.) এরচেয়েও অনেক বেশি কাজ করেছেন। হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন।

খুতবার শেষাংশে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত কতিপয় নিষ্ঠাবান আহমদী সদস্যের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন; তারা হলেন, যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়ার সারপিতো হাদী সাহেব, চৌধুরী বশীর আহমদ ভাট্টি সাহেব, রাবওয়ার হামীদুল্লাহ্ খাদেম সাহেব, পেশোয়ারের মুহাম্মদ আলী খান সাহেব, হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ (রা.)'র পৌত্র যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাহেবযাদা মাহদী লতীফ সাহেব এবং করোনায় মৃত্যুবরণকারী রাবওয়ার ১৬ বছর বয়সী কিশোর স্নেহের ফয়যান আহমদ সামির। হুযূর প্রয়াতদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন এবং নামাযান্তে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান।

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]